International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 232-242
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.216

পাশ্চাত্য দর্শনে পরিবেশ ভাবনার বিবর্তন: প্রি-সোফিস্ট থেকে কান্ট এবং সমকালীন স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন

প্রিয়াঙ্কা সাধুখাঁ
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The relationship between humans and nature has been a central concern in philosophical discourse since the earliest stages of civilization. Despite their dependence on nature, human beings have often treated it merely as a means to fulfil their own interests. In Western philosophy, this tendency is reflected in the dominance of anthropocentrism, which places humans at the center of moral consideration and often leads to speciesist attitudes toward non-human life.

This paper examines the evolution of environmental thought in Western philosophy, tracing its development from the Pre-Socratic period through the Sophists, Socrates, Aristotle, Thomas Aquinas, and modern thinkers such as Descartes, Locke, and Kant. It argues that this tradition has largely upheld an anthropocentric worldview. However, in the twentieth century, environmental ethics underwent a significant transformation through the contributions of Aldo Leopold, Arne Naess, Holmes Rolston III, and Val Plumwood, who emphasized the intrinsic value of nature.

The paper also explores Sustainable Development as a contemporary framework that seeks to balance human needs with environmental responsibility, highlighting the interdependence between humans and nature.

Keywords: Environmental Ethics, Anthropocentrism, Speciesism, Western Philosophy, Sustainable Development

ভূমিকা:

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি মৌলিক প্রশ্ন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হয়ে আসছে। মানুষ প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করে, প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহার করে জীবনধারণ করে এবং সেই প্রকৃতিকেই ভিত্তি করে তার সভ্যতা গড়ে তোলে। মানুষ যেমন তার মায়ের সঙ্গে একটি গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে, তেমনি প্রকৃতির সঙ্গেও তার একটি স্বাভাবিক ও অন্তর্নিহিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু তবুও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই সম্পর্ক সবসময় সমন্বয়পূর্ণ ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ তার মাতৃসত্তার প্রতি যতটা সচেতন ও দায়বদ্ধ, প্রকৃতির প্রতি ততটা সচেতন নয়।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে মানুষ প্রকৃতিকে প্রায়শই নিজের স্বার্থসাধনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। কৃষি, শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আধুনিক ভোগবাদী জীবনযাত্রার বিকাশের ফলে মানুষের এই প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রকৃতি ধীরে ধীরে মানুষের কাছে কেবল একটি ভোগ্যবস্তু বা সম্পদে পরিণত

হয়েছে। এই প্রবণতার ফলে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই দূরত্ব থেকেই বর্তমান সময়ের পরিবেশ সংকটের উৎপত্তি ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়, বন উজাড়, বায়ু ও জল দূষণ ইত্যাদি সমস্যাগুলি আজ মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে এই মনোভাবকে সাধারণত মানবকেন্দ্রিকতা (Anthropocentrism) বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয় এবং প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীকে মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধারণা অনুসারে কেবল মানুষই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান, অন্য সকল সত্তা মানুষের প্রয়োজনের পরিপূরক মাত্র। এই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই জন্ম হয়েছে প্রজাতিবাদ (Speciesism) নামক ধারণার, যেখানে মানুষের প্রজাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয়। ফলে প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলের স্বতন্ত্র মূল্য ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং তাদেরকে কেবল মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রি-সোফিস্ট যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তায় এই মানবকেন্দ্রিক মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রি-সোফিস্ট দার্শনিকরা মূলত বিশ্বতাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে তেমন কোনো বিশ্লেষণ করেননি। সোফিস্টদের সময় থেকে দর্শনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মানুষে স্থানান্তরিত হয় এবং মানুষের জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটলের স্তরবিন্যাস তত্ত্ব, মধ্যযুগে টমাস একুইনাসের ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা এবং আধুনিক যুগে দেকার্ত, লক ও কান্টের দর্শনেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও যুক্তিবৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকে মানুষের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

তবে বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ সংকট ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠার ফলে পরিবেশ নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। Aldo Leopold, Arne Naess, Holmes Rolston III এবং Val Plumwood প্রমুখ দার্শনিকরা প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের স্বতন্ত্র মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতার ধারণা উপস্থাপন করেন। তাদের মতে মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয়; বরং একটি বৃহত্তর জীবসম্প্রদায়ের অংশ, এবং এই জীবসম্প্রদায়ের প্রতি মানুষের নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে সমকালীন সময়ে Sustainable Development বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ধারণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই ধারণা মানুষের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকৃতির সংরক্ষণ—উভয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে পরিবেশ ভাবনার এই ধারাবাহিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রি-সোফিস্ট যুগ থেকে শুরু করে কান্ট পর্যন্ত দার্শনিক চিন্তাধারার আলোকে মানবকেন্দ্রিকতার বিকাশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক পরিবেশ নৈতিকতা এবং Sustainable Development ধারণার মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের একটি নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিও আলোচিত হয়েছে।

মানবকেন্দ্রিকতা ও প্রজাতিবাদ: ধারণাগত বিশ্লেষণ:

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism) এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে মানুষকেই বিশ্বজগতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই মতবাদ অনুসারে মানুষই একমাত্র নৈতিক কর্মের নিয়ামক এবং সেই কারণেই তাকে সত্তা-পিরামিডের সর্বোচ্চ স্থানে স্থান দেওয়া হয়। মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কেবল মানুষকেই স্বতঃমূল্যে

মূল্যবান বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে প্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য সকল সত্তাকে মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ মানুষের স্বার্থ ও প্রয়োজনই এখানে নৈতিক মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড হয়ে ওঠে।

পরিবেশ নৈতিকতার আলোচনায় J. Baird Callicott মানবকেন্দ্রিকতাকে এমন একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সত্তার মূল্য নির্ধারিত হয় মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে।[i] এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলের স্বতন্ত্র মূল্য ও অস্তিত্বকে উপেক্ষা করা হয় এবং তাদেরকে কেবল মানুষের স্বার্থপূরণের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রজাতিবাদ (Speciesism) নামক ধারণার। আধুনিক নীতিবিদ্যার আলোচনায় এই শব্দটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন দার্শনিক Peter Singer।[ii] প্রজাতিবাদ বলতে বোঝায় এমন এক মনোভাব যেখানে কেবল প্রজাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের স্বার্থকে অন্যান্য প্রাণীর স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ মানুষের প্রজাতিগত সদস্যতার কারণেই তাকে নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয় এবং অন্যান্য প্রাণীর স্বার্থকে অবমূল্যায়ন করা হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা বর্ণবাদ বা লিঙ্গবাদের মতোই একটি বৈষম্যমূলক মনোভাবের প্রতিফলন। যেমন বর্ণবাদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, তেমনি প্রজাতিবাদের ক্ষেত্রে মানুষ তার নিজস্ব প্রজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে এবং অন্যান্য প্রাণীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে। প্রজাতিবাদের ফলে মানুষ প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীকে কেবল ভোগ্যবস্তু বা সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এর ফলে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নৈতিক ও সহাবস্থানমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিবর্তে একটি শোষণমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবেশ সংকটের অন্যতম দার্শনিক কারণ হিসেবে এই মানবকেন্দ্রিক ও প্রজাতিবাদী মনোভাবকেই অনেক পরিবেশ দার্শনিক দায়ী বলে মনে করেন।

অতএব বলা যায় যে পরিবেশ নৈতিকতার আলোচনায় মানবকেন্দ্রিকতা ও প্রজাতিবাদ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত দুটি ধারণা। এই ধারণাগুলির সমালোচনা থেকেই আধুনিক পরিবেশ নৈতিকতার বিকাশ ঘটেছে এবং মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নতুনভাবে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে।

প্রি-সোফিস্ট দার্শনিকদের বিশ্বতাত্ত্বিক চিন্তা ও পরিবেশ ভাবনার সীমাবদ্ধতা:

প্রি-সোফিস্ট যুগের দার্শনিকরা মূলত বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। থেলস, অ্যানাক্সিমেনিস, হেরাক্লিটাস এবং এমপিডোক্লিজ প্রমুখ দার্শনিকরা জগতের মৌল উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।
তাদের আলোচনায় প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। তাদের প্রধান আগ্রহ ছিল জগতের উৎপত্তি ও মৌল উপাদানের ব্যাখ্যা প্রদান করা। তবে পিথাগোরাস অমানব প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের আত্মা প্রাণীদের মধ্যেও স্থানান্তরিত হতে পারে। তবুও তার এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে পরিবেশকেন্দ্রিক ছিল না; বরং তা মানবকেন্দ্রিক বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সোফিস্ট ও সক্রেটিস: মানুষকে কেন্দ্র করে নৈতিকতার সূচনা:

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রি-সোফিস্ট যুগের দার্শনিকদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল বিশ্বতত্ত্ব বা প্রকৃতির মৌল উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান। কিন্তু সোফিস্টদের সময় থেকেই দর্শনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই সময় দার্শনিকদের আগ্রহের ক্ষেত্র বিশ্বতত্ত্ব থেকে সরে এসে মানুষ ও

মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের উপর কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে। সোফিস্ট দার্শনিকগণ মানবজীবনের নৈতিকতা, সমাজব্যবস্থা, আইন, রীতি-নীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন।

এই সময়ের অন্যতম প্রধান দার্শনিক প্রোটাগোরাস (Protagoras) তার বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে মানুষকে দর্শনের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন—

"Man is the measure of all things."

এই উক্তির মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং সত্যের বিচার মূলত মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। ফলে মানুষই হয়ে ওঠে সকল মূল্যায়নের কেন্দ্রবিন্দু। এই ধারণার মধ্য দিয়েই দর্শনের আলোচনায় একটি মানবকেন্দ্রিক প্রবণতার সূচনা ঘটে।

পরবর্তীকালে সক্রেটিস (Socrates) এই মানবকেন্দ্রিক আলোচনাকে আরও গভীর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেন। সক্রেটিস মূলত মানুষের নৈতিক জীবন, আত্মজ্ঞান এবং নৈতিক গুণাবলির বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তার মতে মানুষের প্রধান কর্তব্য হল নিজেকে জানা এবং নৈতিকভাবে উন্নত হওয়া। যদিও তিনি প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেননি, তবুও তার দর্শনে মানুষের নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সক্রেটিস মনে করতেন যে মানুষই এই জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা। মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই জগতের বিভিন্ন বিষয়কে বোঝা এবং মূল্যায়ন করা উচিত। ফলে তার দর্শনের মধ্যেও মানুষের প্রতি একটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এইভাবে সোফিস্ট ও সক্রেটিসের সময় থেকেই দর্শনের আলোচনায় মানুষের ভূমিকা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে এই মানবকেন্দ্রিক প্রবণতা পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটলের দর্শনে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে তিনি যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে প্রকৃতির অন্যান্য জীবের তুলনায় উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

অ্যারিস্টটলের স্তরবিন্যাস তত্ত্ব ও প্রাণীজগত:

সক্রেটিস-পরবর্তী যুগের অন্যতম প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রকৃতি ও জীবজগত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে একটি স্তরবিন্যাসমূলক (hierarchical) কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।[iii] তার মতে এই জগতে বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটি উৎকর্ষ-অপকর্ষ ভিত্তিক স্তরবিন্যাস বিদ্যমান।

অ্যারিস্টটল জীবসত্তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিন ধরনের আত্মার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, উদ্ভিদের মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান তাকে তিনি উদ্ভিদাত্মা (vegetative soul) বলে অভিহিত করেন, যার প্রধান কাজ পুষ্টি গ্রহণ ও বংশবৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, প্রাণীদের মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান তাকে তিনি সংবেদনশীল আত্মা (sensitive soul) বলে উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে প্রাণীরা অনুভব করতে পারে এবং চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত, মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান তাকে তিনি যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন আত্মা (rational soul) বলে অভিহিত করেন। এই যুক্তিবুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির কারণেই মানুষ অন্যান্য জীবের তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

অ্যারিস্টটলের মতে মানব আত্মার মধ্যে অপর দুই প্রকার আত্মার গুণাবলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পুষ্টি গ্রহণ, বংশবৃদ্ধি ও সংবেদনশীলতার পাশাপাশি যুক্তিবুদ্ধির ক্ষমতাও বিদ্যমান। এই যুক্তিবুদ্ধির কারণেই মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য জীবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

এই ধারণার ফলস্বরূপ অ্যারিস্টটল মনে করেন যে প্রকৃতিতে নিম্নতর সত্তাগুলি উচ্চতর সত্তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই বিদ্যমান। উদ্ভিদ প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রাণীরা মানুষের প্রয়োজন পূরণের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রকৃতির অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব মূলত মানুষের স্বার্থের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

সুতরাং বলা যায় যে অ্যারিস্টটলের দর্শনে প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও তার স্তরবিন্যাস তত্ত্বের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট মানবকেন্দ্রিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তাকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করার ফলে প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকে মানুষের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে স্থান দেওয়া হয়েছে।

মধ্যযুগে টমাস একুইনাসের ধর্মতাত্ত্বিক মানবকেন্দ্রিকতা:

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় সময়কে অনেক সময় "অন্ধকারময় যুগ" (Dark Age) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এর প্রধান কারণ হল এই সময়ে দর্শনের স্বাধীন অনুসন্ধানমূলক ধারা অনেকাংশে ধর্মতত্ত্বের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণ দর্শনের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীন জ্ঞান অনুসন্ধানের পরিবর্তে ধর্মীয় মতবাদকে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে দর্শনের আলোচনায় ঈশ্বর, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক হলেন টমাস একুইনাস (Thomas Aquinas) ।[iv] তিনি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি সুসংবদ্ধ দার্শনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তার মতে ঈশ্বরই সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং এই বিশ্বজগৎ একটি উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার ফল। এই পরিকল্পনার মধ্যে মানুষ একটি বিশেষ ও উচ্চতর স্থান অধিকার করে।
একুইনাস মনে করতেন যে ঈশ্বর প্রকৃতিকে মূলত মানুষের কল্যাণ ও ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে প্রকৃতির অন্যান্য সত্তা—যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল— মানুষের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে অবস্থান করে। তার মতে কেবল মানুষই যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন এবং নৈতিক বিচার করার ক্ষমতার অধিকারী; তাই নৈতিকতার প্রকৃত বিষয়বস্তু মূলত মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে একুইনাস প্রাণীদের প্রতি মানুষের কোনো প্রত্যক্ষ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করেননি। তার মতে প্রাণীদের প্রতি মানুষের আচরণ মূলত মানুষের নৈতিক চরিত্রের প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ অনৈতিক এই কারণে নয় যে প্রাণীদের প্রতি মানুষের কোনো নৈতিক কর্তব্য রয়েছে; বরং এই কারণে যে এমন আচরণ মানুষের নৈতিক চরিত্রকে বিকৃত করতে পারে এবং পরবর্তীকালে মানুষের প্রতিও নিষ্ঠুর আচরণের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অতএব বলা যায় যে টমাস একুইনাসের দর্শনে প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকে মানুষের তুলনায় গৌণ অবস্থানে স্থাপন করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই মধ্যযুগীয় দর্শনে একটি সুস্পষ্ট ধর্মতাত্ত্বিক মানবকেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক যুগে দেকার্ত, লক ও কান্টের পরিবেশ ভাবনা:

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আধুনিক যুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। এই সময়ে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানচর্চা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু একইসঙ্গে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও একটি নতুন প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে প্রকৃতিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক যুগের দার্শনিকদের চিন্তায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশেষত রেনে দেকার্ত, জন লক এবং ইমানুয়েল কান্টের দর্শনে প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলের প্রতি এই মানবকেন্দ্রিক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক হিসেবে পরিচিত রেনে দেকার্ত (René Descartes) প্রকৃতি ও প্রাণীকুল সম্পর্কে একটি যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন।[v] তার মতে জগৎ মূলত দুটি মৌলিক দ্রব্য দ্বারা গঠিত— চেতন দ্রব্য (res cogitans) এবং জড় দ্রব্য (res extensa)। মানুষের মন বা আত্মা চেতন দ্রব্যের অন্তর্গত, কিন্তু প্রাণী ও প্রকৃতি জড় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে দেকার্ত প্রাণীকুলকে এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে প্রাণীদের কোনো যুক্তিবুদ্ধি বা চেতনা নেই; তারা কেবল যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হয়। ফলে প্রাণীদের প্রতি মানুষের কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতা নেই বলে তিনি মনে করেন। এই ধারণার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও প্রাণীকুলকে মানুষের নিয়ন্ত্রণযোগ্য বস্তু হিসেবে দেখার একটি প্রবণতা শক্তিশালী হয়।

অন্যদিকে জন লক (John Locke) প্রকৃতিকে মূলত সম্পত্তির উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[vi] তার শ্রমতত্ত্ব (labour theory of property) অনুসারে প্রকৃতিতে বিদ্যমান বস্তুসমূহ প্রথমে সকল মানুষের জন্য সাধারণভাবে উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি তার শ্রম প্রয়োগ করে প্রকৃতির কোনো অংশকে রূপান্তরিত করে, তখন সেই বস্তুটি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে মানুষের শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। লকের মতে ঈশ্বর পৃথিবীকে মানুষের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে পারে। এই ধারণা প্রকৃতিকে মানুষের ভোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার একটি দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে।

আধুনিক যুগের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।[vii] কান্টের মতে কেবলমাত্র যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তাই নৈতিক বিধানের অধীন হতে পারে এবং সেই কারণেই কেবল মানুষই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। তার বিখ্যাত শর্তহীন অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে (Categorical Imperative) তিনি বলেন যে মানুষকে কখনোই কেবল উপায় হিসেবে নয়, বরং সর্বদা উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। কিন্তু এই নৈতিক নীতিটি মূলত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কান্টের মতে প্রাণীরা আত্মসচেতন বা যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন নয়; ফলে তাদের প্রতি মানুষের কোনো প্রত্যক্ষ নৈতিক কর্তব্য নেই। তবে তিনি স্বীকার করেন যে প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা উচিত নয়, কারণ তা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। অর্থাৎ প্রাণীদের প্রতি মানুষের কর্তব্য মূলত পরোক্ষ (indirect duty)।

এইভাবে দেখা যায় যে আধুনিক যুগের দার্শনিক চিন্তায় প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকে প্রায়শই মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দেকার্তের যান্ত্রিক প্রকৃতি ধারণা, লকের সম্পত্তি তত্ত্ব এবং কান্টের যুক্তিবৃত্তিনির্ভর নৈতিকতা— এই সবই প্রকৃতি সম্পর্কে একটি মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করেছে। ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যের ধারণা আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক পরিবেশ সংকট ও Sustainable Development দর্শন:

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের উপর মানুষের চাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বন উজাড়, জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ু ও জল দূষণ, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অযৌক্তিক ব্যবহার পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্যকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে

তোলে। এই পরিস্থিতি মানবসভ্যতার সামনে একটি মৌলিক নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে— মানুষ কি প্রকৃতির উপর সীমাহীন অধিকার ভোগ করতে পারে, নাকি প্রকৃতির প্রতিও মানুষের কিছু নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ নৈতিকতার একটি নতুন দার্শনিক ধারা বিকশিত হয়। এই ধারার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক Aldo Leopold। তার বিখ্যাত "Land Ethic" তত্ত্বে তিনি নৈতিকতার পরিসরকে কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মাটি, জল, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল—অর্থাৎ সমগ্র জীবমণ্ডলের দিকে প্রসারিত করার প্রস্তাব করেন। Aldo Leopold তার বিখ্যাত গ্রন্থ *A Sand County Almanac* (1949) গ্রন্থে এই বিষয়ে বলেন "The land ethic simply enlarges the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals, or collectively: the land."[viii]

—Aldo Leopold, A Sand County Almanac (1949) তার মতে মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয়; বরং একটি বৃহত্তর জীবসম্প্রদায়ের সদস্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> "A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community; it is wrong when it tends otherwise."

অর্থাৎ কোনো কাজ তখনই নৈতিকভাবে সঠিক যখন তা জীবসম্প্রদায়ের অখণ্ডতা, স্থিতি ও সৌন্দর্য রক্ষা করে। এই ধারণা পরিবেশ নৈতিকতায় একটি মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করে এবং প্রকৃতিকে একটি স্বতন্ত্র নৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনার ভিত্তি তৈরি করে।

পরবর্তীকালে নরওয়েজীয় দার্শনিক Arne Naess তার Deep Ecology তত্ত্বের মাধ্যমে পরিবেশ নৈতিকতাকে আরও গভীর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেন।[ix] তিনি "Deep Ecology" এবং "Shallow Ecology"-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে দেখান যে প্রচলিত পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়াস প্রায়শই মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু Deep Ecology মতে সকল জীবেরই নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে এবং মানুষ কোনোভাবেই অন্যান্য জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করার নৈতিক অধিকার রাখে না। Naess মনে করেন আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বিকৃত করেছে; তাই মানুষের উচিত প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ককে নতুনভাবে পুনর্বিবেচনা করা এবং নিজেকে সমগ্র জীবমণ্ডলের একটি অংশ হিসেবে উপলব্ধি করা।

এছাড়াও আমেরিকান দার্শনিক Holmes Rolston III পরিবেশ নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[x] তিনি প্রকৃতির স্বতন্ত্র নৈতিক মূল্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তার মতে প্রকৃতির প্রতিটি জীব তার নিজস্ব বিবর্তনীয় ইতিহাসের ধারক এবং সেই কারণেই তাদের স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। মানুষ কেবল নিজের স্বার্থের ভিত্তিতে প্রকৃতিকে মূল্যায়ন করতে পারে না; বরং প্রকৃতির স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতার একটি শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে।

অন্যদিকে অস্ট্রেলীয় দার্শনিক Val Plumwood পাশ্চাত্য দর্শনের মানবকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের গভীর সমালোচনা করেছেন।[xi] তার মতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বৈততা সৃষ্টি করা হয়েছে—যেখানে মানুষকে যুক্তিবাদী ও উচ্চতর সত্তা হিসেবে দেখা হয় এবং প্রকৃতিকে নিম্নতর ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Plumwood এই দ্বৈততার বিরোধিতা করে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং দেখান যে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়; বরং প্রকৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পরিবেশ নৈতিকতার আলোচনায় Hans Jonas-এর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[xii] তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Imperative of Responsibility-এ তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি মানুষের নৈতিক দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। আধুনিক প্রযুক্তিগত সভ্যতার প্রেক্ষাপটে Jonas মনে করেন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কেবল বর্তমান মানবসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং সমগ্র জীবমণ্ডলের প্রতিও মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ নৈতিকতার ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়বিচারের ধারণাকে গুরুত্ব দেয়।

একইভাবে Peter Singer তার প্রাণী অধিকার বিষয়ক আলোচনায় প্রজাতিবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তার মতে কেবল প্রজাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রাণীদের স্বার্থকে উপেক্ষা করা নৈতিকভাবে অযৌক্তিক। Singer utilitarian নীতির ভিত্তিতে যুক্তি দেন যে সকল সংবেদনশীল জীবের দুঃখ-কষ্ট সমানভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এইভাবে তিনি প্রাণী নৈতিকতার আলোচনাকে পরিবেশ নৈতিকতার বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করেন।

অন্যদিকে Bryan Norton পরিবেশ নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন।[xiii] তার মতে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিকতা এবং পরিবেশকেন্দ্রিকতার মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত সমন্বয় প্রয়োজন। Norton মনে করেন মানুষের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষার জন্যই পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য; তাই পরিবেশ নীতিতে ব্যবহারিক এবং নীতিগত উভয় দিকের সমন্বয় থাকা উচিত।

এই সব দার্শনিক চিন্তার প্রেক্ষাপটে সমকালীন সময়ে Sustainable Development বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ধারণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৮৭ সালে Brundtland Commission তাদের বিখ্যাত রিপোর্ট Our Common Future-এ Sustainable Development-কে সংজ্ঞায়িত করে—

> "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."[xiv]

অর্থাৎ যে উন্নয়ন বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণ করে কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে না তাকেই স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন বলা হয়।

এই ধারণা মূলত তিনটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—

১. পরিবেশ সংরক্ষণ
২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
৩. সামাজিক ন্যায়

দর্শনগত দৃষ্টিকোণ থেকে Sustainable Development ধারণা মানবকেন্দ্রিকতা এবং পরিবেশকেন্দ্রিকতার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। এখানে মানুষকে প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভু হিসেবে দেখা হয় না; আবার মানুষকে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না। বরং মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ ১৭টি Sustainable Development Goals (SDGs) ঘোষণা করে, যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই ভোগ ও উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[xv] এই লক্ষ্যসমূহ মানবসভ্যতার উন্নয়নকে পরিবেশগত ভারসাম্যের সঙ্গে সমন্বিত করার একটি বৈশ্বিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়।

অতএব বলা যায় যে সমকালীন পরিবেশ নৈতিকতা এবং Sustainable Development ধারণা পাশ্চাত্য দর্শনের দীর্ঘ মানবকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুনর্মূল্যায়নের ফল। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে একটি সমন্বিত, দায়িত্বশীল এবং নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

দার্শনিক মূল্যায়ন:

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক মূলত মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। প্রি-সোফিস্ট যুগে দার্শনিকদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল বিশ্বতত্ত্ব বা জগতের মৌল উপাদানের অনুসন্ধান। যদিও এই আলোচনায় প্রকৃতির উপাদান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়, তবুও মানুষ ও প্রকৃতির নৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট আলোচনা সেখানে পাওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে সোফিস্ট ও সক্রেটিসের সময়ে দর্শনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ স্থান লাভ করে। প্রোটাগোরাসের "Man is the measure of all things" উক্তি মানুষের অভিজ্ঞতা ও বিচারক্ষমতাকে জ্ঞান ও মূল্যবোধের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দর্শনের ইতিহাসে মানবকেন্দ্রিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করে।

অ্যারিস্টটলের স্তরবিন্যাস তত্ত্বেও প্রকৃতির একটি ক্রমান্বিত কাঠামো দেখা যায় যেখানে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে উৎকর্ষের ভিত্তিতে পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মানুষের যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তাকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করার ফলে প্রকৃতির অন্যান্য জীবকে মানুষের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে রাখা হয়েছে। এই ধারণা পরবর্তীকালে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে।

মধ্যযুগে টমাস একুইনাস খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার মতে ঈশ্বর প্রকৃতিকে মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রকৃতি ও প্রাণীকুলের নৈতিক মূল্য মানুষের তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে। আধুনিক যুগে দেকার্ত, লক ও কান্টের দর্শনেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। দেকার্ত প্রাণীকুলকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, লক প্রকৃতিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং কান্ট কেবল যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তাকেই স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলে স্বীকার করেন। ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তায় প্রকৃতিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদ হিসেবে দেখার প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ সংকট ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠার ফলে এই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। Aldo Leopold, Arne Naess, Holmes Rolston III এবং Val Plumwood প্রমুখ দার্শনিকরা প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করে পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতার ধারণা উপস্থাপন করেন। তাদের মতে মানুষ প্রকৃতির প্রভু নয়; বরং একটি বৃহত্তর জীবসম্প্রদায়ের অংশ।

এই দার্শনিক পুনর্বিবেচনার ফলস্বরূপ সমকালীন সময়ে Sustainable Development ধারণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এই ধারণা মানুষের উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে মানুষের অস্তিত্ব এবং উন্নয়ন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল; তাই প্রকৃতির সঙ্গে একটি দায়িত্বশীল ও সমন্বিত সম্পর্ক গড়ে তোলা অপরিহার্য।

অতএব দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে পরিবেশ সংকটের সমাধানের জন্য কেবল প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়; বরং মানুষের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। মানবকেন্দ্রিকতার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিই ভবিষ্যতের পরিবেশ নৈতিকতা এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে পাশ্চাত্য দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাসে পরিবেশ ভাবনা প্রধানত মানবকেন্দ্রিক ছিল। তবে আধুনিক পরিবেশ সংকট মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে।

সমকালীন পরিবেশ নৈতিকতা ও Sustainable Development ধারণা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরতার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পথ নির্দেশ করছে। এই ধারণা বর্তমান প্রজন্মের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার— উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেয়।

অতএব বলা যায়, পরিবেশ সংকটের সমাধানের জন্য মানুষের উচিত মানবকেন্দ্রিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে প্রকৃতির সঙ্গে একটি সমন্বিত ও দায়িত্বশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা। দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নতুন পরিবেশ নৈতিকতাই মানবসভ্যতার টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার অন্যতম পথ নির্দেশ করতে পারে।

Endnotes:

[i] J. Baird Callicott, In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy (Albany: State University of New York Press, 1989).

[ii] Peter Singer, Animal Liberation (New York: HarperCollins, 1975).

[iii] Aristotle, De Anima, trans. J.A. Smith, in The Basic Works of Aristotle, ed. Richard McKeon (New York: Random House, 1941).

[iv] Thomas Aquinas, Summa Theologica, trans. Fathers of the English Dominican Province (New York: Benziger Brothers, 1947).

[v] René Descartes, Discourse on Method and Meditations on First Philosophy, trans. Donald A. Cress (Indianapolis: Hackett Publishing, 1998).

[vi] John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

[vii] Immanuel Kant, Lectures on Ethics, trans. Louis Infield (Indianapolis: Hackett Publishing, 1963).

[viii] Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New York: Oxford University Press, 1949).

[ix] Arne Naess, "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement," Inquiry 16, no. 1–4 (1973): 95–100.

[x] Holmes Rolston III, Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World (Philadelphia: Temple University Press, 1988).

[xi] Val Plumwood, Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason (London: Routledge, 2002)

[xii] Hans Jonas, The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (Chicago: University of Chicago Press, 1984).

[xiii] Bryan G. Norton, Toward Unity among Environmentalists (New York: Oxford University Press, 1991).

[xiv] World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987).

[xv] United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (New York: United Nations, 2015).

Bibliography:

1. Aristotle. Politics. Oxford: Clarendon Press.
2. Aquinas, Thomas. Summa Theologica.
3. Callicott, J. Baird. In Defense of the Land Ethic. Albany: SUNY Press, 1989.
4. Descartes, René. Discourse on Method.
5. Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge University Press.
6. Leopold, Aldo. A Sand County Almanac. Oxford University Press, 1949.
7. Locke, John. Second Treatise of Government.
8. Naess, Arne. "The Shallow and the Deep Ecology Movement." Inquiry, 1973.
9. Plumwood, Val. Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason. Routledge, 2002.
10. Rolston III, Holmes. Environmental Ethics. Temple University Press.
11. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015.